Vol. 5 | No. 1 | 1961

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আলবেরুনীর ভারত-তত্ত্ব

Volume	5
Issue	1
Year	1961
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ
Published online	June 15, 1961
DOI	10.62328/sp.v5i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v5i1.2
Pages	13-34
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

আলবেরুনীর ভারত-তত্ত্ব

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্

Check for updates

এক

।। সংস্কৃত ছন্দরীতি ।।

ব্যাকরণ ও ছন্দবিজ্ঞান অন্যান্য বিদ্যাচর্চ্চার সেতু স্বরূপ। এ দু'টির মধ্যে 'ব্যাকরণ' নামক শাস্ত্রটির প্রতি ভারতীয়রা বেশী গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। ব্যাকরণ বাক্যের শুদ্ধ প্রয়োগ ও শব্দের ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞান, যার সাহায্যে বাচনে ও রচনায় পারদর্শিতা অর্জন করা যায়। আমরা অবশ্য এ বিজ্ঞান শিখে তেমন লাভবান হতে পারব না, কারণ এ শাস্ত্র এমন এক মূল থেকে উৎপন্ন হয়েছে যা আমাদের আয়ত্তের বাইরে, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা।

এই শাস্ত্রের যে সব পুস্তকের নাম আমি শুনেছি তা এই :

১। স্বর্গরাজ ইন্দ্রের রচনা বলে কথিত—ঐন্দ্রগ্রন্থ।
২। চান্দ্র নামক রক্তাম্বরধারী এক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রচনা—'চান্দ্র'।
৩। সাকৃতায়ণ সম্প্রদায়ের 'সাকৃত' নামক এক ব্যক্তির রচিত—সাকাত্।
৪। পাণিনির গ্রন্থ।
৫। সর্ব্ব বর্মন প্রণীত 'কাতান্তব'।
৬। শশীদেব কৃত 'শশীদেব বৃত্তি'।
৭। 'দুর্গাবৃত্তি' (সম্ভবতঃ যবনদেবকৃত 'দুর্'ত বৃত্তি'।
৮। উগ্রভুত রচিত 'শিষ্যহিত বৃত্তি'।

আমি শুনেছি যে এই শেষোক্ত লেখক আমাদেরই যুগের জয়পালপুত্র আনন্দ পালের শিক্ষক ছিলেন। রচনা শেষ করে উগ্রভুত পুস্তকটি কাশ্মীরে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেখানকার লোকেরা অত্যন্ত অহঙ্কারী ও পরিবর্তনবিমুখ বলে এই নূতন ব্যাকরণ পুস্তকটির তেমন আদর করলো না। লেখক তখন রাজার কাছে অনুযোগ করলো। গুরুর প্রতি কর্তব্য পালনের ইচ্ছায় রাজা তাঁর অভিলাষ পুরণ করার

আশ্বাস দিলেন এবং দুই লক্ষ দিরহাম ও উপযুক্ত উপঢৌকনাদি কাশ্মীরে পাঠিয়ে তিনি আদেশ দিলেন যে, 'শিষ্যহিতবৃত্তি' যারা অধ্যয়ন করবে তাদের মধ্যেই এই ধন বিতরণ করা হবে। তখন অর্থের লোভে সবাই পুস্তকটির প্রতি আকৃষ্ট হোল, এমনকি ব্যাকরণের অন্য সব গ্রন্থ নকল করাও তারা ছেড়ে দিল। উগ্রভুতের রচনাটির এই ভাবে প্রচার ও খ্যাতি হয়।

ব্যাকরণ শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দুদের একটি গল্প আছে। 'সমল বাহন' —শুদ্ধভাষায় সাতবাহন—নামে ওদের এক রাজা একদিন তার স্ত্রীদের সাথে জলক্রীড়া করছিলেন, এমন সময় তাদের একজনকে রাজা বল্লেন—'মৌদকম্ দেহি'—জল ছিটিওনা। রমণীটি ভাবল রাজা 'মোদকম্ দেহিঃ' – আমাকে মিষ্টান্ন দাও—বল্‌ছেন। সে তখন মিষ্টান্ন এনে রাজাকে দিতে গেলে রাজা তাকে ভর্ৎসনা করলো। তাতে রমনীটি রাজার প্রতি রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করলো। রমণীর এই ব্যবহারে রাজা মনঃক্ষুন্ন হয়ে হিন্দুদের প্রথামত অন্নজল ত্যাগ করে নির্জনবাস করতে লাগলেন। অবশেষে একজন জ্ঞানী লোক রাজার কাছে এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে সকলকে ব্যাকরণ ও শব্দের ধাতুরূপ শিখিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। লোকটি তারপর অন্নজল ত্যাগ করে মহাদেবের আরাধনা করতে লাগলো। মহাদেব তখন তাকে দর্শন দিলেন এবং আবুল আস্‌ওয়াদ আলদুয়ালি আরবী ভাষার জন্য যেরকম প্রয়োগবিধি রচনা করেছিলেন সেই রকম কয়েকটি নিয়ম তাকে শিখিয়ে দিয়ে এই শাস্ত্রকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। জ্ঞানী লোকটি তখন রাজার কাছে ফিরে গিয়ে মহাদেব রচিত বিধিগুলি তাঁকে শিখিয়ে দিলেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রের সূচনা এই ভাবে হয়।

ব্যাকরণের পরই ছন্দের স্থান। কাব্যের মাত্রানীতির নাম 'ছন্দ', আমাদের (عروض) ওরূজ্-এর মত। ছন্দ-জ্ঞান হিন্দুদের জন্য অপরিহার্য, কারণ ওদের সমস্ত পুস্তক-ই ছন্দোবদ্ধ কাব্যে রচিত, যাতে মুখস্থ করা সহজ হয়, এবং যাতে একান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে কাউকেই লিখিত পুস্তক দেখ্‌তে না হয়। এর কারণ, ওরা মনে করে যে মানুষের মন স্বভাবতঃই সামঞ্জস্য (symmetry) ও বিন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং বিশৃঙ্খলাকে বর্জন করতে চায়। সেজন্য দেখা যায়, অধিকাংশ হিন্দু-ই কাব্যে আসক্ত, অর্থ না বুঝলেও কবিতা আবৃত্তি করতে ভালবাসে, আনন্দে ও উৎসাহে করতালি দিতে থাকে। সহজবোধ্য হলেও গদ্যের প্রতি হিন্দুদের অনুরাগ নাই।

ওদের বেশীর ভাগ গ্রন্থ-ই শ্লোকে রচিত। বর্তমানে আমিও এই শ্লোক রচনা অভ্যাস করছি, কারণ হিন্দুদের জন্য আমি Euclid ও Almagest পুস্তক দু'টির সংস্কৃত তর্জমার কাজ হাতে নিয়েছি। তাছাড়া, Astrolabe নির্মাণ করার পদ্ধতিও আমি ওদের ভাষায় লিখে ওদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি। জ্ঞান প্রচারের আগ্রহে-ই আমি এসব কাজ করছি। যা ওদের নাই এমন কোনও নুতন বিদ্যা বা গ্রন্থ হিন্দুরা পেলে তৎক্ষণাৎ ওরা তাকে শ্লোকে রূপান্তরিত করতে লেগে যায়। শ্লোক সহজবোধ্য নয়, কারণ ছন্দোবদ্ধ পদ্য রচনা আয়াসসাধ্য, সেজন্য রচনা আড়ষ্ট হয়। তার দরুণ কী যে গোলযোগ হয় তা ভারতীয়দের সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে। শ্লোকগুলি যদি আবার গদ্যের মত সরল অনাড়ম্বর হয় তাহলে ভারতীয়রা অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়। ওদের সম্বন্ধে আমি এখানে যা বল্‌ছি তা সত্য না হলে আল্লা আমার বিচার করবেন।

ছন্দ বিজ্ঞানের উদ্ভাবক হচ্ছেন পিঙ্গল ও "চলিত" (?)। ছন্দ সংক্রান্ত প্রচলিত পুস্তকের সংখ্যা বহু। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে, লেখকের নামানুসারে অভিহিত "গায়স্‌ত" (?) নামক পুস্তকটি। এটি এতই বিখ্যাত যে ছন্দ বিজ্ঞানও ঐ নামে উল্লেখিত হয়ে থাকে। আরও কয়েকটি পুস্তক আছে, 'মৃগলাঞ্ছন', 'পিঙ্গল' ও 'আওলিয়ান্দের' লেখা। আমি অবশ্য এ সব পুস্তকের কোনোটিই দেখিনি আর ব্রহ্মসিদ্ধান্তের যে অধ্যায়ে ছন্দ ও মাত্রা নির্দ্ধারণের কথা আছে তারও বিশেষ কিছু আমি জানিনা। কাজেই, ভারতীয় ছন্দ বিজ্ঞানের পূর্ণ জ্ঞান আমি দাবী করতে পারিনা, আমার আরও অধ্যয়ন আবশ্যক। তবে, সেই ওজুহাতে বিষয়টির আলোচনা স্থগিত রাখা বা এড়িয়ে যাওয়াও আমি অনুচিত মনে করি।

অ-কারান্ত ও হস্‌-অন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের গণনায় আমাদের খলীল বিন্‌ আহমদ ও অন্যান্য ছন্দ তাত্ত্বিকরা যে চিহ্ন ব্যবহার করেছেন, সিলেব্‌ল্‌ (অক্ষর) গণনায় ভারতীয়রা ও সেই রূপ সঙ্কেত চিহ্ন ব্যবহার করে থাকে। সে চিহ্নগুলি এই : । ও < ; প্রথম চিহ্নকে 'লঘু' ও দ্বিতীয় চিহ্নকে 'গুরু' বলা হয়। মাত্রা ছন্দের এক 'গুরু'কে দুই 'লঘু'র সমান বলে ধরা হয়। ওদের আরও একটি সিলেব্‌ল্‌ (অক্ষর) আছে যার নাম 'দীর্ঘ', এর মাত্রা বা পরিমাণ এক 'গুরু'র সমান। আমার মনে হয়, এটি আসলে ব্যঞ্জন বর্ণের দীর্ঘ অকারান্ত রূপ। এখন পর্যন্ত অবশ্য এই 'লঘু-গুরুর' প্রকৃতি আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, সেজন্য আরবী থেকে অনুরূপ দৃষ্টান্ত দিতে পার্চ্ছিনা। তবে আমার যেন মনে হচ্ছে, 'লঘু' হসন্ত ব্যঞ্জন বর্ণের সিলেব্‌ল্‌ নয়।

আর 'গুরু'ও অ-কারান্ত ব্যঞ্জন বর্ণ নয়। বরঞ্চ, 'লঘু' হ্রস্ব অকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সিলেব্‌ল্, আর 'গুরু' হচ্ছে আরবী ছন্দ বিজ্ঞানের 'সাবাব' নামক বাক্যাংশের মত হ্রস্ব অকারন্ত ও হস্-অন্ত ব্যঞ্জন বর্ণের সম্মিলিত সিলেব্‌ল্। আমার এ সন্দেহের কারণ এই, যে ভারতীয়রা ছেদ না দিয়ে একের পর এক ক্রমাগত 'লঘু' সিলেব্‌ল্ ব্যবহার করে যায়। আরবীতে কিন্তু তুইটি হসন্ত বর্ণ পর পর উচ্চারণ করা যায় না; তবে অন্যান্য ভাষায় তা সম্ভব। পারস্যের ছন্দ বিজ্ঞানীরা এই রূপ ব্যঞ্জন বর্ণকে 'লঘু' অকারান্ত বর্ণ বলে থাকে। তবে এক সাথে যদি এরূপ বর্ণ তিনটির অধিক থাকে তাহলে তার উচ্চারণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, অথচ হ্রস্ব অকারান্ত বর্ণের অনেকগুলি সিলেব্‌ল্ পর পর উচ্চারণ করে যেতে কিছু মাত্র অসুবিধা হয় না; যেমন (আরবীতে) بدنك كمثل صفتك و فمك بسعة شفتك তাছাড়া, কোনও শব্দ হসন্ত বর্ণ দিয়ে আরম্ভ হলে তার উচ্চারণ কষ্টকর হয়ে পড়ে। কিন্তু হিন্দুদের বহু বিশেষ্য (noun) ঠিক হসন্ত দিয়ে না হলেও, হ্রস্ব-অকারান্ত হরফ দিয়ে আরম্ভ হয়। পদ্যের প্রথমে এই রূপ বঞ্জন বর্ণ থাক্‌লে, সিলেব্‌ল গণনায় তাকে ধরা হয় না, কেননা 'গুরু' ধ্বনির নিয়ম হোল যে স্বর বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের পরে বস্‌বে, আগে নয়।

আমাদের মুসলমানেরা পদ্য গঠনের জন্য فعل শব্দের বিভিন্ন রূপকে ওজন বা পদভাগ (foot) হিসাবে ধরে নিয়ে তাকে নানা ভাবে সাজিয়ে কতকগুলি ছাচ বা বিন্যাস তৈরী করে নিয়েছে, এবং প্রত্যেক পদভাগের অন্তর্ভুক্ত স্বরান্ত ও হসন্ত অক্ষরের সংখ্যা নির্দেশ করার জন্য যেমন কতকগুলি চিহ্নের উদ্ভাবন করেছে, হিন্দুরাও তেমনই 'লঘু' ও 'গুরু' ধ্বনি দিয়ে গঠিত পদভাগ নির্দেশ করার জন্য কতকগুলি নাম ব্যবহার করে থাকে। এ নাম দিয়ে আসলে ওরা এক বিশেষ ধ্বনি সমষ্টি বা পরিমাণ বোঝাতে চায়। এরূপ নামকরণের উদ্দেশ্য ছন্দের শ্রেণী বিভাগ করা, যাতে ঐ নামাঙ্কিত প্রত্যেক পদভাগগুলিতে সিলেব্‌ল্ (অক্ষর) সংখ্যার তারতম্য হলেও এবং 'লঘু' 'গুরু' ধ্বনির পারম্পর্য পার্থক্য থাকলেও পর্বের ধ্বনি সমষ্টির পরিমান বা ওজন একই থাকে। ওজন শব্দ দিয়ে আমি উচ্চারণ কাল বোঝাতে চাচ্ছি যার একক (unit) কে ওরা 'মাত্রা' বলে। এই একক পরিমাণ অনুযায়ী 'লঘু'তে থাকে একমাত্রা, আর 'গুরু'তে তুই মাত্রা। পদভাগের (foot) ছন্দলিপিকরণে ওরা অক্ষরের (syllable) সংখ্যা না ধরে কেবল তাদের মাত্রার উল্লেখ করে থাকে। আরবীতেও এই রকম করা হয়। যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের

দ্বিত্বকে (تشديد) হসন্ত ও স্বরান্ত দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ বলে গননা করা হয়, কিম্বা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে tanwin থাকলে, গননায় তাকে দুইটি স্বরান্ত ও হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ রূপেই দেখানো হয়ে থাকে।

'লঘু' ও 'গুরু' ধ্বনির নিজস্ব কতকগুলি নাম দেওয়া হয়েছে। লঘুর নাম যেমন 'ল' 'কলি' 'রূপ' 'চামর' ও 'গ্রহ'; 'গুরু'র নাম 'গ', 'নিবুর' (নিভ্র ?) ও 'অর্দ্ধাংশক'। শেষোক্ত নাম থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে পূর্ণ 'অংশক' দুই 'গুরু'র সমান হবে। ছন্দশাস্ত্রের পুস্তকগুলি পদ্যে রচনা করার জন্যই হিন্দুরা এই সব নামের উদ্ভাবন করেছে। সেজন্য ওরা এত সব নাম আবিষ্কার করেছে যে এর কোনও না কোনও একটা ছন্দের সাথে মিলে যাবেই যাবে।

'লঘু' ও গুরুর বিভিন্ন প্রকারের বিন্যাসে যে সব পদভাগ (foot) গঠিত হয় তা এই :—

১। ॥= দ্বি আক্ষরিক ও দ্বি মাত্রিক ; অক্ষর ও মাত্রা, উভয়ের সংখ্যাই দুই।

২। ।< ও <। =কেবল অক্ষরে দুই সংখ্যক, মাত্রায় নয়। (এখানে দুইটি পদভাগে অক্ষর দুইটি, কিন্তু মাত্রা তিনটি করে।) দ্বিতীয় পদভাগ (<।) কে 'কৃত্তিকা বলা হয়।

৩। চার মাত্রার বিভিন্ন পদভাগকে প্রত্যেক পুস্তকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে যেমন :

< < = পক্ষ (অর্থাৎ অর্দ্ধমাস)
।। < = জ্বলন, অর্থাৎ অগ্নি।
। < । = মধ্য
< ।। = পর্বত ; একে 'হর' ও 'রস' ও বলা হয়েছে।
।।।। = ঘণ।

৪। পাঁচ মাত্রার পদভাগের নানা রূপ আছে ; যে গুলির বিশেষ নাম আছে তা এই :

। < < = হস্তিন্	< < । = (?)
< । < = কাম	।।। < = কুসুম।

৫। < < < = ছয় মাত্রার পদভাগ।

কেউ কেউ আবার এই সব পদভাগ গুলিকে দাবার ঘুটির নামে অভিহিত করে থাকে ; যথা, জ্বলন = গজ। মধ্য = রথ, পর্বত = পদাতিক, ঘণ = অশ্ব।

হরিয়ুদ্ধ (? হরিভট্ট ?) নামক এক ব্যক্তির রচনা বলে খ্যাত একটি অভিধানিক পুস্তকে তিন 'গুরু' বা তিন 'লঘু' ধ্বনির বিভিন্ন পদভাগকে এক একটি ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন ঃ

ম = < < < ছয় মাত্রার পদভাগ (ষড়গুণাত্মক)

য় = । < < = হস্তিন্

র = < । < = কাম

ত = < < ।

স = । । < = জ্বলন

য = । < । = মধ্য

ভ = < । । = পর্বত

ন = । । । = ত্রিগুণাত্মক, (তিন মাত্রার পদভাগ)।

এই সব চিহ্নদ্বারা গ্রন্থকার বীজগণিতের প্রক্রিয়াতে এই আট প্রকার পদভাগ গঠন শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। "গুরু বা লঘু, যে কোনও একটি ধ্বনিকে অবিমিশ্র ভাবে প্রথম পংক্তিতে বসাও (< < <, অথবা । । ।), পরের পংক্তিতে অন্যধ্বনি (গুরু বা লঘু) টি প্রথমে বসাও, বাকী দুটি প্রথম প্রকারের ধ্বনিই থাক্‌বে। তৃতীয় পংক্তিতে এই সংমিশ্রিত ধ্বনিটিকে (গুরু বা লঘু) আবার মধ্যে, এবং চতুর্থ পংক্তিতে, শেষে বসাও। তাহলে তোমার প্রথম চরণ গঠন সম্পূর্ণ হবে।"

"দ্বিতীয় চরনের জন্য সর্ব নিম্নের পংক্তিতে দ্বিতীয় প্রকারের ধ্বনি (গুরু বা লঘু) অবিমিশ্র ভাবে বসাও, প্রথম প্রকারের ধ্বনির একটি তার উপরের পংক্তির অন্তে বসিয়ে শূন্যস্থানগুলি যথাযথ ভাবে প্রথম পংক্তিতে ব্যবহৃত ধ্বনি দিয়ে পূরণ কর। দ্বিতীয় চরণের গঠন তাহলে সম্পূর্ণ হবে এবং তিন মাত্রার সমস্ত সম্ভাব্য পদভাগ দেখানো শেষ হবে।"

'গুরু' 'লঘুর' চিহ্ন অনুযায়ী পদভাগের এই বিন্যাস গুলি তা হলে এই রূপ

দেখাবে—

প্রথম চরণ =	১ম পদভাগ ঃ	< < <	কিম্বা	। । ।
	২য় —	। < <	,,	< । ।
	৩য় —	< । <	,,	। < ।
	৪র্থ	< < ।	,,	। । <
২য় চরণ—				
	৫ম পদভাগ ঃ	। । <	অথবা	< < ।
	৬ষ্ঠ —	। < ।	,,	< । <
	৭ম —	< । ।	,,	। < <
	৮ম —	। । ।		< < <

প্রকরণটি (Permutation) অবশ্য ঠিক, কিন্তু এই প্রকরণ-বিন্যাসে প্রত্যেক পদভাগের স্থান নির্ণয়নের যে পদ্ধতি দেখানো হয়েছে তা শুদ্ধ নয়। গ্রন্থকার বল্‌ছেন ; পদভাগের প্রত্যেক লঘু ও গুরু অক্ষর (সিলেবল্) এর সাঙ্কেতিক সংখ্যা ২ ধরে নাও ; তাতে প্রত্যেক পদভাগকে ২, ২, ২, এই সঙ্কেতে প্রকাশ করা যাবে। এখন পদভাগের বামের সংখ্যাকে মধ্যকার সংখ্যা দিয়ে গুণ কর ; গুণফলকে আবার দক্ষিণের সংখ্যা দিয়ে গুণ কর। এই দক্ষিণের সংখ্যাটি যদি গুরু ধ্বনির সঙ্কেত হয় তাহলে বাম ও মধ্যের সংখ্যার গুণফল থেকে এক বাদ দিয়ে তবে দক্ষিণের সংখ্যার সাথে গুণ করবে।"

গ্রন্থকার উপরের তালিকায় সন্নিবেশিত ষষ্ঠ অর্থাৎ 'মধ্য' নামিত (=।<।) পদভাগ দিয়ে এ প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। ২ কে ২ দিয়ে গুণ করে গুণফল থেকে এক বাদ দিয়ে তৃতীয় অঙ্কের সাথে বিয়োগফলকে গুণ করে তিনি ৬ পেয়েছেন।

এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কিন্তু উপরের তালিকাভুক্ত পদভাগের অধিকাংশের ক্ষেত্রে অনুরূপ ফল পাওয়া যাবেনা। সেজন্য আমার সন্দেহ হয় পুস্তকটির পাঠে কিছু বিকৃতি ঘটেছে। আমার মতে এই পদভাগ গুলির বিন্যাস এই নিয়মে হবে ঃ

প্রথম চরণ ঃ—	ক	খ	গ	দ্বিতীয় চরণ ঃ—	ক	খ	গ
১।	<	<	<	৫।	<	<	।
২।	।	<	<	৬।	।	<	।
৩।	<	।	<	৭।	<	।	।
৪।	।	।	<	৮।	।	।	।

অর্থাৎ, ক সারিতে উপর থেকে নিচের দিকে ধ্বনিগুলি লঘু-গুরু-লঘু বা গুরু-লঘু-গুরু এই পর্যায়ে বস্‌বে। খ সারিতে একপ্রকারের দুটি ধ্বনির পর অন্য প্রকারের দুটি ধ্বনি বস্‌বে, এবং গ সারিতে একপ্রকারের চারটি ধ্বনির পর অন্য প্রকারের চারটি ধ্বনি বসবে।

এর পর উপরোক্ত গ্রন্থকার আরও বলেছেন ঃ "পদভাগের (foot) প্রথম ধ্বনি যদি গুরু হয়, তাহলে মধ্যের সংখ্যাদিয়ে গুণকরার আগে তার থেকে এক কমিয়ে নাও। যদি গুণক ও গুরু ধ্বনি হয়, তাহলে গুণফল থেকে এক কমিয়ে নাও। এই ভাবে উপরোল্লিখিত পদভাগের বিন্যাসে প্রত্যেক পদভাগের স্থান নির্ণিত হবে।"

আরবী পদ্য যেমন 'ওরূজ' ও 'জর্ব' (প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের শেষ পদভাগ) দিয়ে ভাগ করা হয়, তেমনই ভারতীয়দের পদ্যও দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক ভাগকে 'পদ' বা চরণ বলা হয়। গ্রীকরাও এই ভাগকে 'চরণ' বলে।

পদ্য তিন কিম্বা সাধারণতঃ চার পদে ভাগ করা হয়। কখনও কখনও একটি পঞ্চম পদ তার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। পদগুলির মধ্যে কোন মিল (rhyme) থাকেনা, তবে আরবীতে ক্বাফিয়ার (قافیه) মত এক প্রকারের ছন্দ আছে যাতে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের অন্তস্বরে মিল থাকে, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষ বর্ণেও তেমনই মিল থাকে। এ ধরনের পদ্যকে 'আর্যা' বলা হয়। চরণের শেষে 'লঘু' স্বর 'গুরু' স্বরে পরিণত হতে পারে, যদিও 'আর্যাকে' সাধারণত ঃ 'লঘু' অন্তক ছন্দ বলেই ধরা হয়।

ওদের কাব্যে অনেক প্রকারের ছন্দ আছে। পঞ্চপদী ছন্দে পঞ্চম পদটিকে তৃতীয় ও চতুর্থ পদের মাঝে বসান হয়। সিলেবল্ ও পদের সংখ্যানুযায়ী ছন্দের নামভেদ হয়। একটি দীর্ঘ কবিতার সমস্ত পদই একই ছন্দে হওয়া হিন্দুরা পছন্দ করেনা। সেজন্য, একই কাব্যে ওরা নানা ধরণের ছন্দ ব্যবহার করে থাকে। কাব্যটি তখন রঙীন সুতায় কাজ করা চীনাংশুকের মত দেখায়।

চৌপদি ছন্দে পদের গঠন এইরূপ হয়—

১ম পদ ঃ	<<	পক্ষ = ১ অংশক	২য় পদ ঃ	<<	পক্ষ
	<।।	পর্বত		।।<	জ্বলন
	।।<	জ্বলন		।<।	মধ্য
				<।।	পর্বত
				<<	পক্ষ

৩য় পদ ঃ
<< পক্ষ
<।। পর্বত
<< পক্ষ

৪র্থ পদ ঃ
<< পক্ষ
।।< জ্বলন
।<। মধ্য
<।। পর্বত
।।< জ্বলন

এটি হচ্ছে চৌপদি কবিতার 'স্কন্দ' নামক একটি ছন্দের উদাহরণ। এর দুই ভাগ ; প্রত্যেক ভাগে আটটি করে 'অংশক' আছে। তার মধ্যে, প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম অংশক 'মধ্য' পদভাগ (অর্থাৎ ।<।) হওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু ষষ্ঠ অংশক 'মধ্য' নয়ত 'ঘন' এই দুই এর যে কোনও একটি পদভাগ হতে-ই হবে। এই নিয়ম পালন করার পর অন্য অংশকগুলিতে কবির ইচ্ছা বা অভিরুচি অনুযায়ী যে কোনও প্রকারের পদভাগ বসান যেতে পারে তবে পদভাগের সংখ্যায় কম-বেশী করা চলবেনা।

পদ রচনায় অংশকগঠনের এই নিয়ম অনুসরণ করা হলে চৌপদি কবিতার পদগুলির এই ভাবে লিপিকরণ করা যাবে ঃ—

১ম পদ— << <।। ।।<
২য় পদ— << ।।< ।<। <।। <<
৩য় পদ— << <।। <<
৪র্থ পদ— << ।।< ।<। <।। ।।<

কাবতাটি এই প্রক্রিয়ায় রচনা করতে হবে।

এই সব চিহ্ন দিয়ে যদি আরবী ছন্দ প্রকাশ করা যায় তাহলে তার অন্য অর্থ দাঁড়াবে, কেননা আরবীতে এসব চিহ্ন দিয়ে হ্রস্ব স্বরান্ত ও হলন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বোঝান হয়। উদাহরণ স্বরূপ, আমি فعل ধাতুর ক্রিয়াপদ দিয়ে 'খফীফ' ছন্দের একটি সম্পূর্ণ পদের লিপিকরণ দেখাচ্ছি।

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

আরবী notation এ ঃ (ডান থেকে বাম দিকে পড়তে হবে) } ।০।০০।০ ।০০।০।০ ।০।০০।০

হিন্দুদের চিহ্নে ঃ— <<।< <।<< <<।<

(শেষের চিহ্নগুলি, ভারতীয়দের লিখন রীতি অনুযায়ী বাম থেকে ডান দিকে নয়, আরবী রীতিতে ডান থেকে বাম দিকে পড়তে হব।)

আমি একবার আগেও বলেছি, এখন আবার বলছি, যে ভারতীয় ছন্দের জ্ঞান আমার এমন বেশী নয় যে পাঠককে এ শাস্ত্রের সমস্ত তত্ত্ব বোঝাতে পারি। তবে সাধ্যমত চেষ্টা করতে আমি ত্রুটি করব না।

যে চৌপদি কবিতার প্রতি পদের পদ ভাগ (foot) ও সিলে্ব্‌ল্ সংখ্যার চিহ্নগুলি এমন অবিকল ভাবে অন্য পদের সমান যে একটি পদ জানা থাকলে অন্য পদগুলির গঠন সহজেই অনুমান করা যায়, তাকে 'বৃত্ত' বলা হয়। ভারতীয়দের আর একটি নিয়ম আছে যে চার সিলেব্‌লের কম কোনও পদ হয় না, কারণ বেদে এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর পদ নাই। সে জন্য সব চেয়ে ছোট পদ হচ্চে চার অক্ষরের, আর সবচেয়ে দীর্ঘ পদ ছাব্বিশ অক্ষরের।

বৃত্ত-ও আবার ২৩ প্রকারের হয়। এই ২৩টি বৃত্তের গঠন নীচের বর্ণনানুযায়ী হবে।

১। প্রত্যেক পদে চারটি অক্ষর থাক্‌বে কিন্তু একটি গুরুর পরিবর্তে দুইটি 'লঘু' অক্ষর (সিলেব্‌ল) বসানো চলবে না।

২। (এই দ্বিতীয় প্রকারের চৌপদি বৃত্তের গঠনপ্রকৃতি আমার কাছে স্পষ্ট হয় নি তাই এর বর্ণনা বাদ দিচ্ছি।)

৩। এই বৃত্তের 'পদ'গুলিতে কেবল 'ঘন' ও'পক্ষ' অংশক থাকবে (=।।।। ও <<)

৪। দুই 'গুরু' দুই 'লঘু' ও তিন 'গুরু' দিয়ে বৃত্তের প্রত্যেক পদ তৈরী হবে। (<<+।।+<<<)। এই বৃত্তের বর্ণনা 'পক্ষ'+জ্বলন+'পক্ষ', এই ভাবে করলেই ভাল হয়। (বাকী বৃত্তগুলিকে সেই ভাবেই বর্ণনা করা গেল)

৫। ২ 'কৃত্তিক'+জ্বলন+পক্ষ (=<।<।+।।<+<+)

৬। 'ঘন'+'মধ্য'+'পক্ষ' (=।।।।+।<।+<<)

৭। 'ঘন'+'পর্বত'+'জ্বলন' (=।।।।+<।।+।।<)

৮। 'কাম'+'কুসুম'+'জ্বলন'+'গুরু' (=<।<+।।।<+।।<+<)

৯। 'পক্ষ'+''হস্তিন্‌'+জ্বলন+'মধ্য'+পক্ষ (=<<+।<<+।।<+।<।+<<)

১০। ‘পক্ষ’ + ‘পর্বত’ + ‘জ্বলন’ + ‘মধ্য’ + ‘পক্ষ’ (= << + <|| + ||< + |<| + <<)

১১। ‘পক্ষ’ + ‘মধ্য’ + ২ ‘জ্বলন’ + ‘হস্তিন’ (= << + |<| + ||<||< + |<<)

১২। ‘ঘন’ + ‘জ্বলন’ + ‘পক্ষ’ + ২ ‘হস্তিন্ (= |||| + ||< + << + |<< |<<)

১৩। ‘পর্বত’ + ‘কাম’ + ‘কুসুম’ + ‘মধ্য’ + ‘জ্বলন’ (= <|| + <|< + |||< + |<| + ||<)

১৪। ‘হস্তিন্ + ‘পক্ষ’ + ‘পর্বত’ + ‘কুসুম’ + ‘পর্বত’ + ‘লঘু’ + ‘গুরু’ (|<< + << + <|| + |||< + <|| + | + <)

১৫। ২ ‘পক্ষ’ + ‘পর্বত’ + ‘কুসুম’ + ২‘কাম’ + ‘গুরু’ (= << + << + <|| |||< + <|< + <|< + <)

১৬। পক্ষ + পর্বত + কাম + কুসুম + পক্ষ + লঘু + ‘গুরু’ (= << + <|| + <|< + |||< + << + | + <

১৭। ২‘পক্ষ’ + ‘পর্বত’ + ‘ঘন’ + ‘জ্বলন’ + ‘পক্ষ’ + ‘কুসুম’ (= << + << + <|| + |||| + ||< + << + |||<)

১৮। ২ পক্ষ + পর্বত + ঘন + জ্বলন + ২ কাম + গুরু (= << + << + <|| + |||| + ||< + <|< + <|< + <)

১৯। গুরু + ২ পক্ষ + পর্বত + ঘন + জ্বলন + ২ কাম + গুরু = < + << + << + <|| + |||| + ||< + <|< + <|< + <)

২০। ৪ পক্ষ + জ্বলন + মধ্য + পক্ষ + ২ মধ্য + গুরু (<< + << + << + << + ||< + |<| + << + |<| + |<| + <)

২১। ৪ পক্ষ + ৩জ্বলন + ২মধ্য + গুরু (= << + << + << + << + ||< + ||< + ||< + |<| + |<| + <)

২২। ৪ পক্ষ + কুসুম + মধ্য + জ্বলন + ২মধ্য + গুরু (= << + << + << + << + |||< + |<| + ||< + |<| + |<| + <)

২৩। ৮ গুরু + ১০লঘু + কাম + জ্বলন + লঘু + গুরু (< + < + < + < + < + < + < + < + |||||||||| + <|< + ||< + | + <)

'বৃত্তের' এ তালিকা জেনে তেমন কোনও উপকার না হ'লেও বিস্তারিতভাবে এটি এখানে দেওয়া হোল এই জন্য যে এতে 'লঘু' সিলেব্‌লের বাহুল্য দেখে পাঠক বুঝ্‌তে পারবে যে 'লঘু'র অর্থ আসলে হলন্তবর্ণ নয়, হ্রস্ব স্বরান্ত বর্ণ। ভারতীয়রা কি ভাবে ছন্দ বর্ণনা করে, কেমন করে পদ্যের ছন্দোলিপিকরণ করে, এর থেকে তাও বোঝা যাবে। পাঠক আরও বুঝতে পারবে যে খলীল বিন্ আহমদ নিজ প্রতিভা বলেই আরবী ছন্দ শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন, যদিও, হিন্দুদের ছন্দরীতির কথা তিনি শুনেছিলেন, এ অনুমানের মূলে কিছু সত্য থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। ভারতীয়দের ছন্দ-তত্ত্ব নিয়ে আমার এত পরিশ্রম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'শ্লোক' রচনার নিয়ম স্থির করা, কেননা ওদের প্রায় সমস্ত গ্রন্থ-ই এই শ্লোকে রচিত।

'শ্লোক' চৌপদি ছন্দের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক চরণে আট অক্ষর (সিলেব্‌ল্) থাকে, কিন্তু চরণ ভেদে তাদের বিন্যাস পৃথক হয়। চার পদের প্রতি পদের শেষ অক্ষরটি 'গুরু' হওয়া আবশ্যক, আবার প্রত্যেক পদের পঞ্চম অক্ষর 'গুরু' আর ষষ্ঠ অক্ষর 'লঘু' হতে হবে। সপ্তম অক্ষরটি দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে 'লঘু' আর প্রথম ও তৃতীয় পদে 'গুরু' হতে হবে। অন্যান্য অক্ষরগুলি কবির রুচি ও সুবিধানুযায়ী হতে পারে।

ছন্দ প্রকরণে ভারতীয়রা অঙ্ক শাস্ত্র কীভাবে প্রয়োগ করে তা দেখাবার জন্য ব্রহ্মগুপ্তের রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি এখানে দিচ্ছি। "কাব্যের আদি রূপ হোল গায়ত্রী, দুই পদের ছন্দ। এখন, আমরা যদি ধরে নিই যে এই ছন্দে অক্ষরের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে চব্বিশ (২৪) আর সর্ব্বনিম্ন সংখ্যা চার, তাহলে পদের সর্ব্বনিম্ন অক্ষর সংখ্যানুযায়ী এই দুই পদকে ৪ + ৪, এই অঙ্কে প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু যে হেতু অক্ষরের (সিলেব্‌ল্) সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে ২৪, সেহেতু ২৪ থেকে ৪ + ৪ এর বিয়োগফল অর্থাৎ ১৬ কে যদি দক্ষিণের অঙ্কের (অর্থাৎ ৪) সাথে যোগ করি তা হলে আমরা ৪ + ২০ পাই। যদি ত্রিপদী ছন্দ হয় তা হলে এই নিয়মে তার আঙ্কিক রূপ দাঁড়াবে ৪ + ৪ + ১৬। পদের যে অঙ্কটি দক্ষিণে থাকে অন্যান্য পদগুলি থেকে তাকে স্বতন্ত্র ধরা হয়। আর সে জন্য তার বিশেষ নাম থাকে। আর তার বামে অবস্থিত পদের অঙ্কগুলি পরস্পরের সাথে যুক্ত বলে সেগুলির অন্য নাম থাকে। চৌপদী ছন্দের আঙ্কিকরূপ হবে ৪ + ৪ + ৪ + ১২।"

"কিন্তু কবি যদি ন্যূনতম সংখ্যার অর্থাৎ চার অক্ষরের পদ ব্যবহার না করে এবং দ্বিপদী ছন্দে ২৪ অক্ষরের কতগুলি combination ব্যবহার হতে পারে, তা যদি আমরা জান্‌তে চাই, তা হলে, প্রথমে আমরা বামে ৪ ও দক্ষিণে ২০ লিখ্‌বো। এবারে চারের সাথে এক যোগ করে সে যোগ ফলের সাথে আবার এক যোগ করব। তারপর ২০ থেকে এক বিয়োগ করে, সে বিয়োগ ফল থেকে আবার এক বিয়োগ ক'রে যা থাক্‌বে, তা প্রথমোক্ত দুটি সংখ্যা, অর্থাৎ ৪ ও ২০ নীচে বসাব। এই পদ্ধতিতে বামের সংখ্যাকে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে আরে দক্ষিণের সংখ্যাকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আন্‌তে থাক্‌ব যতক্ষণ না বামে ২০ ও দক্ষিণে ৪ সংখ্যা পাচ্ছি। পাশের উদাহরণ থেকে সংখ্যা-বিন্যাসটি বোঝা যাবে।

৪	২০
৫	১৯
৬	১৮
৭	১৭
৮	১৬
৯	১৫
১০	১৪
১১	১৩
১২	১২
১৩	১১
১৪	১০
১৫	৯
২৬	৮
১৭	৭
১৮	৬
১৯	৫
২০	৪

এই combination এর সংখ্যা হোল ১৭, অর্থাৎ ২০ আর ৪ এর বিয়োগ ফলের চেয়ে এক বেশী।"

"চব্বিশ অক্ষরের ত্রিপদীর যে আদি ছন্দরূপ তাতে প্রত্যেক পদের ন্যূনতম অক্ষর সংখ্যা ৪+৪+১৬ হবে। এই ছন্দে অক্ষরের সম্ভাব্য combination জান্‌তে হলে, এই সংখ্যাত্রয়ের কেবল দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা দুটি (৪+১৬) নিয়ে উপরোক্ত পদ্ধতিতে বাড়িয়ে ও কমিয়ে নীচের দিকে নিয়ে যেতে হবে। তার সঙ্গে প্রথম সংখ্যা (৪) টিও আমরা বামে লিখ্‌বো কিন্তু তাতে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি করব না। এর উদাহরণ এই ঃ—

৪	৪	১৬
৪	৫	১৫
৪	৬	১৪
৪	৭	১৩
৪	৮	১২
৪	৯	১১
৪	১০	১০
৪	১১	৯
৪	১২	৮
৪	১৩	৭
৪	১৪	৬
৪	১৫	৫
	১৬	৪

এই প্রক্রিয়ায় আমরা ১৪টি permutation পাচ্ছি। পর পৃষ্ঠায় লেখা প্রক্রিয়ায়

সংখ্যাগুলির স্থান পরিবর্তন করে নিলে, permutation এর সংখ্যা আরও ছয় গুণ অর্থাৎ ৭৮ দাঁড়াবে।

১। তৃতীয় সংখ্যাটিকে না সরিয়ে কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার স্থান বিনিময় কর, এবং যে সংখ্যাটি দ্বিতীয় স্থানে এল, তাতে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি না করে শুধু অন্য দুটি সংখ্যায় উপরোক্ত রীতিতে ক্ষতি বৃদ্ধি করে যেতে থাক। যথা—

৪	৪	১৬
৫	৪	১৫
৬	৪	১৪
৭	৪	১৩
৮	৪	১২ —ইত্যাদি

২। দক্ষিণের, অর্থাৎ তৃতীয় স্থানের সংখ্যা (১৬) কে মধ্যে বসাও, অন্য দু'টি সংখ্যা দুই দিকে রাখ। বামের সংখ্যাকে অপরিবর্তিত রেখে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যাকে উপরোক্ত রীতিতে যোগ বিয়োগ করতে থাক।

৩। এটি দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় বর্ণিত বিন্যাসের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ, অর্থাৎ যে সংখ্যাটির কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না, তাকে বামে না বসিয়ে দক্ষিণে বসাতে হবে।

৪। গরিষ্ঠ সংখ্যাটি (১৬)কে বামে রেখে অপরিবর্তনীয় সংখ্যাকে মধ্যে বসাও।

৫। গরিষ্ঠ সংখ্যাকে বামে বসিয়ে অপরিবর্তনীয় সংখ্যাকে দক্ষিণে বসাও।

"তাছাড়া পদের অক্ষর সংখ্যা যেহেতু দুই এর বর্গ (square) অনুযায়ী বাড়তে থাকে (যেমন চার এর পরে আট) সেহেতু ৮+৮+৮ এই অঙ্ক দিয়েও আমরা ত্রিপদী ছন্দের অক্ষর সংখ্যা প্রকাশ করতে পারি। তবে পদের যে গাণিতিক বিশেষত্ব আছে তা অন্য নিয়মাধীন। চৌপদী ছন্দের প্রকরণ (permutation) সংখ্যাও উপরোক্ত আঙ্কিক বিন্যাসে প্রকাশ করা যেতে পার।"

ব্রহ্মগুপ্ত রচিত এই পুস্তকের এই একটি পাতার বেশী পড়বার সুযোগ কিন্তু আমার হয়নি। তবে এ পুস্তকে যে গণিতের নানা সূত্র বর্ণিত আছে, তাতে সন্দেহ নাই। আল্লাহ তার কৃপায় যদি আমাকে শক্তি ও সামর্থ দেন তাহলে পুস্তকে বর্ণিত তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করতে পারব, এ আশা রাখি।

গ্রীকদের গ্রন্থাদি থেকে যতদূর আমি ধরতে পেরেছি তাতে মনে হয় তারাও কাব্য রচনায় হিন্দুদের মত-ই পদ ভাগ (feet) ব্যবহার করত। কারণ Galenus তাঁর Kataganes গ্রন্থে লিখেছেন, "Manecrates নিষ্ঠীবন থেকে যে ঔষধ আবিষ্কার করেছিলেন, Democrates তিন পদের একটি পদ্যে তার বর্ণনা করেছেন।

দুই

॥ বেদ পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থ সমূহ ॥

বেদের অর্থ হচ্ছে অজ্ঞাতের জ্ঞান। বেদ ব্রহ্মার মুখনিসৃত ঐশ্বরিক বাণী। ব্রাহ্মণেরা অর্থ না বুঝেই বেদ পাঠ করে থাকে; আর এই ভাবে একজন অপরের নিকট বেদ শিক্ষা করে থাকে। অতি অল্প লোকই এর অর্থ বোঝে। বেদের মর্মগ্রহণ ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়ে শাস্ত্র বিচারে পারদর্শী হয়েছে, এমন লোকের সংখ্যা আরও অল্প। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে বেদ শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের কাউকে বেদশিক্ষা দেবার অধিকার নাই, এমন কি ব্রহ্মণকেও নয়। বৈশ্য ও শূদ্রের বেদ মন্ত্র উচ্চারণ বা পাঠ ত' দূরের কথা, শ্রবণাধিকারও নাই। এদের কারুর বিরুদ্ধে যদি এমন কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহলে ব্রাহ্মণ তাকে রাজার কাছে ধরে নিয়ে গিয়ে তার জিহ্বা ছেদন করে তাকে শাস্তি দেওয়াবে।

বেদে নানারূপ বিধিনিষেধ, ও হিতকর্মে উৎসাহদান ও অহিত কর্ম থেকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও শাস্তির বিস্তারিত বিবরণ আছে। তবে বেদের অধিকাংশই স্তোত্র ও অসংখ্য প্রকারের কঠিন যজ্ঞের বর্ণনাতে পূর্ণ। বেদ লিপিবদ্ধ করা নিষেধ, কারণ বেদমন্ত্র কতকগুলি বিশেষ সুরে গাওয়া নিয়ম। তাতে লেখনী স্পর্শ করা বারণ, যাতে তার পাঠে কোনও রূপ বিকৃতি বা তারতম্য না ঘটতে পারে।

এই নিয়মের ফলে হিন্দুরা অনেকবার বেদ হারিয়ে ফেলেছিল। ওদের বিশ্বাস যে সৃষ্টির সূচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বর ও ব্রহ্মার কথোপকথনের যে বিবরণ শুক্রগ্রহের মুখ থেকে সৌনক শুনেছিলেন তাতে এই কথাগুলি আছে, "মহাপ্লাবনে পৃথিবী নিমজ্জিত হবার সময়ে তুমি বেদ বিস্মৃত হবে; বেদ তখন পাতালে প্রবিষ্ট হবে এবং মৎস্য ব্যাতীত অন্য কেহ তাকে উদ্ধার করে আনতে পারবে না। আমি তখন মৎস্য পাঠাব, সে বেদ তোমার হাতে এনে দেবে। আমি বরাহ পাঠাব, সে তার দন্তে ধারণ করে পৃথিবীকে জল থেকে উত্তোলন করবে।" ওরা আরও বলে থাকে যে বিগত দ্বাপর যুগে বেদোক্ত সকল শাস্ত্রীয় ও রাজসূয় ক্রিয়াকর্ম লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। দ্বাপর যুগের ব্যাখ্যা আমরা যথাস্থানে করব। অবশেষে পরাশর পুত্র ব্যাস বেদকে আবার পুনরুজ্জীবিত করেন। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হয়েছে;

প্রত্যেক মন্বন্তরের আরম্ভে যজ্ঞাংশভুক্ দেবগন, মানব ও দেবগণের অধীশ্বর, সসাগরা পৃথিবীর অধিকারী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা যুগপতি মানব, ও প্রত্যেক যুগান্তে লুপ্ত বেদের পুনরুদ্ধারকারী সপ্তর্ষী মণ্ডলের সৃষ্টি হয়।”

এই কারণেই আমাদের অনতিকাল পূর্বে বাসুক্র নামে কাশ্মীরের এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে বেদের ব্যাখ্যা ও অনুলিখনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অন্য কেহ এর গুরু দায়িত্ব নিতে সাহস করত না। কিন্তু তিনি এ কঠিন কর্ম সুসম্পন্ন করলেন, কারণ তাঁর আশঙ্কা ছিল যে কালক্রমে মানুষ বেদ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হবে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে মানুষের সদুদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং সততা রক্ষায় ও কর্তব্যপালনে তাদের তেমন উৎসাহ বা স্পৃহা নাই।

হিন্দুদের বিশ্বাস, বেদে এমন কতকগুলি মন্ত্র আছে যা বাস গৃহে পাঠ করা অনুচিত, কারণ সে-সব মন্ত্র শ্রবণ মাত্র মানুষ ও পশুর গর্ভপাত হয়। সে জন্য সে মন্ত্রগুলি পাঠ করার সময় ওরা উন্মুক্ত স্থানে চলে যায়। এরূপ ভীতিপ্রদ ভাব থেকে মুক্ত পদ বেদে অল্প-ই আছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি, ভারতীয়দের পুস্তকাদি, আরবী rajaz এর মত ছন্দোবদ্ধ ভাষায় রচিত। তার বেশীর ভাগই শ্লোক নামক এক প্রকার ছন্দ রচিত। ছন্দোবদ্ধ ভাষার প্রতি ভারতীয়দের অনুরাগের কারণ আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। Galenusও ছন্দোবদ্ধ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করার পক্ষপাতী ছিলেন। Kataganes নামক পুস্তকে তিনি লিখেছেন: “ঔষধের পরিমাণ জ্ঞাপক একক সংখ্যাগুলি অনুলিখনে বিকৃত হতে পারে। সে হিসাবে, Democrates এর ঔষধি গ্রন্থটির অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে সুখ্যাত ও জনপ্রিয় হবার সঙ্গত কারণ আছে, কেননা, সম্পূর্ণ পুস্তকটি গ্রীক ছন্দে রচিত।” বাস্তবিক-ই, জনপ্রিয়তার ফলে পদ্য রচনাতে গদ্যের চেয়ে বেশী বিকৃতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

সম্পূর্ণ বেদ কিন্তু উপরোক্ত শ্লোকে রচিত নয়, অন্য ছন্দও আছে। ভারতীয়দের অনেকে বলে থাকে যে কেউ-ই বেদে ব্যবহৃত ছন্দে পদ রচনা করতে পারে না। কিন্তু ওদের পণ্ডিতদের মত ভিন্ন, তারা মনে করে সে ছন্দে পদ রচনা ওদের পক্ষে অসম্ভব নয়, তবে এ মহাগ্রন্থের সম্মান রক্ষার জন্য ওরা তার চেষ্টা করেনা।

বেদকে ব্যাস চার খণ্ডে ভাগ করেছেন: ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। ব্যাসের চারটি শিষ্য ছিল, তাদের প্রত্যেককে তিনি একটি করে বেদ

শিক্ষা দিয়েছিলেন, যাতে তারা স্মৃতিতে ধারণ করতে অপারগ না হয়। চার বেদের উপরোক্ত ক্রমানুযায়ী সে চার শিষ্যের নাম পৈর, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি, ও সুমন্ত। চতুর্বেদের প্রত্যেকটির পাঠের বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে। প্রথম বেদ হোল ঋগ্বেদ। ঋক ছন্দে রচিত পদের সমষ্টি বলে এর নাম ঋগ্বেদ। এতে যজ্ঞাদির কথা আছে। তিন প্রকারে ঋগ্বেদ পাঠ করা যায়। প্রথম, অন্যসব পুস্তক পাঠের মত সমান সুরে। দ্বিতীয়, প্রত্যেক শব্দের পর বিরতি দিয়ে, আর তৃতীয় পদ্ধতি হোল প্রত্যেক শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে একটি পংক্তি বা পদাংশ পাঠ করে, সে অংশটিকে পরবর্তী অপঠিত পংক্তির একাংশের সাথে মিলিয়ে আবার পাঠ করা; তার পর, কেবল এই নূতন পংক্তির অংশটিকে আবার স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করে তার পরবর্তী অপঠিত পংক্তির কিছু ভাগ তার সাথে যোগ করে আবার পাঠ করা। এই ভাবে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে যেতে হবে যার ফলে প্রত্যেকটি শব্দ ও পংক্তি দু'বার পঠিত হবে। এই পাঠবিধিটিই শ্রেষ্ঠ কেননা এতে পুন্য সঞ্চয় হয় বেশী।

যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি কান্‌ড়ী ছন্দে রচিত। 'যজুর' শব্দের অর্থ 'কান্‌ড়ী' সমষ্টি। ঋগ্বেদ আর যজুর্বেদে পার্থক্য এই যে শেষোক্ত বেদের মন্ত্রগুলি সন্ধির নিয়মানুযায়ী পাঠ করা যায়; ঋগ্বেদের ক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ। এই দুইটি বেদে-ই যজ্ঞ সংক্রান্ত ক্রিয়া কর্মের বিবরণ আছে।

সন্ধির নিয়মানুযায়ী ঋগ্বেদ পাঠ নিষিদ্ধ হবার কারণ সম্বন্ধে আমি এই গল্পটি শুনেছি। মুনি যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর নিকট থাকা কালে তার গুরুর এক ব্রাহ্মণ বন্ধুর বিদেশ যাত্রার প্রয়োজন হোল। বন্ধুটি গুরুকে অনুরোধ করে পাঠালেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর গৃহের হোমাগ্নি যাতে নিভে না যায়, তার দিকে যেন তিনি দৃষ্টি রাখেন এবং অগ্নিতে আহুতি দেবার জন্য প্রত্যহ যেন কোনও শিষ্যকে তাঁর গৃহে পাঠান। গুরু তাঁর শিষ্যদের মধ্যে থেকে পালাক্রমে একজন করে তাঁর বন্ধুর গৃহে পাঠাতে লাগলেন। অবশেষে সুদর্শন ও সুবেশী যাজ্ঞবল্ক্যের পালা এল। ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সম্মুখে তার গৃহে আহুতির নির্দিষ্ট ক্রিয়া আরম্ভ করতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য অনুভব করলেন যে তাঁর সুন্দর বেশভূষার জন্য ব্রাহ্মণীর মনে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা হয়েছে। আহুতি ও মন্ত্রপাঠ শেষ করে তিনি ব্রহ্মণীর মস্তকে জল ছিটাতে গেলে (কারণ, মন্ত্রপাঠের পর ফুৎকার দেওয়া ওদের কাছে গর্হিত) ব্রাহ্মণী বল্লে, 'ঐ কাষ্ঠস্তম্ভে জল ছিটাও।' জল ছিটানো মাত্রই

স্তম্ভটি সবুজ পত্রে সুশোভিত হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে ব্রাহ্মণী অনুতপ্ত হোলো, এবং পরদিনও যাজ্ঞবল্ক্যকে পাঠাতে গুরুকে অনুরোধ করতে এল। যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু তার নির্দিষ্ট দিন ব্যতীত অন্য দিনে সেখানে যেতে সম্মত হোলেন না। গুরুর অনুরোধ ও তিরস্কারে কোনও ফল হোলনা। তিরস্কৃত হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য অবশেষে গুরুকে বল্লেন: আমাকে যা শিখিয়েছ তা সব প্রত্যাহার করে নাও। এই কথা বলা মাত্র তিনি যা শিখেছিলেন তার সমস্ত ভুলে গেলেন। তিনি তখন সূর্যকে গিয়ে বললেন: আমাকে বেদ শিক্ষা দাও। সূর্য বললেন: তা কেমন করে হবে? আমি নিয়তই চলমান, আর তুমি আমার সাথে সাথে চল্তে অক্ষম।• যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু সূর্যের রথের সাথে সংলগ্ন হয়ে থাকলেন এবং বেদ শিক্ষা করতে লাগলেন। চলমান রথের আন্দোলনের জন্য তাঁকে মধ্যে মধ্যে বেদোচ্চারণ বন্ধ রাখতে হোত।

সামবেদে যজ্ঞাদি ও বিধিনিষেধের বর্ণনা আছে। এর মন্ত্রগুলি গীতের মত সুর করে পাঠ করা হয় বলে এরূপ নামকরণ হ'য়েছে। 'সাম' অর্থ শ্রুতিমধুর আবৃত্তি। এরূপ আবৃত্তি করার কারণ এই যে, একদা নারায়ণ বামণের রূপ ধরে বলি রাজার কাছে এসে নিজকে ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত করেন, এবং সুমধুর সুরে সামবেদের মন্ত্র পাঠ করতে আরম্ভ করেন। সে সুরে বলি রাজা তন্ময় হয়ে যায়, এবং সে তন্ময়াবস্থার ফলে তার পুরাণে বর্ণিত দশা ঘটে।

অথর্ববেদ কিন্তু সন্ধির নিয়মে রচিত। এর ছন্দ ঋক্ ও যজুর্বেদের মত নয়। (অর্থাৎ শ্লোক ও কান্‌ড়ী ছন্দ নয়)। অথর্ববেদ 'ভর' নামক আর এক প্রকার ছন্দে রচিত, অনুনাসিক স্বরে পাঠ করতে হয়। অন্যসব বেদের তুলনায় অথর্ববেদে লোকের অনুরাগ অল্প। এতেও যাগযজ্ঞের বর্ণনা ও তার সঙ্গে মৃতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের নির্দেশ আছে।

তারপর 'পুরাণ'। পুরাণের অর্থ, প্রাথমিক আদিম। পুরাণের সংখ্যা আঠার; তার অধিকাংশই মানুষ ও দেবতার নামাঙ্কিত। কারণ হয় তাতে ঐ সব জীবের বৃত্তান্ত, নয়ত তাদের কোনও প্রাসঙ্গিক উল্লেখ, কিম্বা তাদের মুখে উচ্চারিত প্রশ্নোত্তর আছে। পুরাণগুলি ঋষিদের রচনা।

যে সব পুরানের নাম আমি হিন্দুদের মুখে শুনে লিখে নিয়েছিলাম তা এই:

১। আদি পুরাণ
২। মৎস্য পুরাণ
৩। কুর্ম পুরাণ
৪। বরাহ পুরাণ

৫। নরসিংহ পুরাণ (সিংহমুখ মানুষ) ৭। বায়ু পুরাণ

৬। বামন পুরাণ (ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষ) ৮। নন্দ পুরাণ (নন্দ মহাদেবের অনুচর)

৯। স্কন্দ পুরাণ (স্কন্দ, মহাদেবের পুত্র)।

১০। আদিত্য পুরাণ (অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র)।

•১১। সোম পুরাণ।

১২। সাম্ব পুরাণ (সম্ব বিষ্ণুর পুত্র)।

১৩। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ (ব্রহ্মাণ্ড অর্থ আকাশ মণ্ডল)।

১৪। মার্কণ্ডেয় পুরাণ (মার্কণ্ডেয় ঋষির নাম)।

১৫। তরিক্ষ পুরাণ (এটি গরুড় পাখি)।

১৬। বিষ্ণুপুরাণ (বিষ্ণু, নারায়ণ)।

১৭। ব্রহ্মপুরাণ (পৃথিবী পালনে নিযুক্ত প্রকৃতি)।

১৮। ভবিষ্য পুরাণ (অনাগত সৃষ্টি)।

এই পুরাণগুলির মধ্যে আমি কেবল মৎস্য, আদিত্য ও বায়ুপুরাণের কিয়দংশ মাত্র দেখবার সুযোগ পেয়েছি।

পুরাণ সমূহের আর একটি ঈষৎভিন্ন তালিকা আমাকে পড়ে শোনানো হয়েছিল। সে তালিকাটিও আমি নকল করে দিচ্ছি, কেননা শ্রুত তথ্যের বিভিন্ন পাঠ (version) যথাযথ ভাবে উদ্ধৃত করা-ই কর্তব্য।

ব্রহ্ম পুরাণ।

পদ্ম পুরাণ—(পদ্ম-রক্তকমল)।

বিষ্ণু পুরাণ

শিবপুরাণ—(শিব অর্থাৎ মহাদেব)।

ভাগবৎ পুরাণ—(অর্থাৎ বাসুদেব)।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

অগ্নি পুরাণ।

ভবিষ্য পুরাণ—(অর্থাৎ অনাগত)।

ব্রহ্ম বৈবর্ত—(অর্থাৎ বায়ু)।

লিঙ্গ পুরাণ—(মহাদেবের জননেন্দ্রিয়)।

বরাহ পুরাণ।

স্কন্দ পুরাণ।

বামন পুরাণ।

কুর্ম পুরাণ।

মৎস্য পুরাণ।

গরুড় পুরাণ—(গরুড় বিষ্ণুর বাহন পক্ষী বিশেষ)।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

এই তালিকাটি বিষ্ণুপুরাণে দেওয়া আছে।

'স্মৃতি' গ্রন্থ হচ্ছে বেদ থেকে উৎপন্ন। এটি বিধিনিষেধ সংক্রান্ত পুস্তক। ব্রহ্মার নিম্নলিখিত কুড়িজন পুত্র এ গ্রন্থ রচনা করে।

আপস্তম্ব	যাজ্ঞবল্ক্য
পরাশর	অত্রি
শাতাতপ	হারীত
সম্বর্ত	লিকিত
দক্ষ	সঙ্খ
বশিষ্ঠ	গৌতম
অঙ্গিরা	বৃহস্পতি
যম	কাত্যায়ন
বিষ্ণু	ব্যাস
মনু	উশনস

এ ছাড়া, শাস্ত্র বিধান, ঈশ্বরতত্ত্ব, সন্ন্যাস, দেবত্বলাভ, ও সংসার থেকে নিষ্কৃতি বিষয়ে ভারতীয়দের আরও অনেক গ্রন্থাদি আছে। যেমন, সন্ন্যাসী গৌরের রচিত তারই নামাঙ্কিত গ্রন্থ, কপিল প্রণীত 'সাংখ্য' নামক ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ, মোক্ষলাভ ও ঈশ্বরের সাথে আত্মার যোগ বিষয়ক 'পাতঞ্জস' গ্রন্থ ইত্যাদি। 'ন্যায় ভাষা' নামে কপিলের আর একটি পুস্তক আছে যাতে ব্যাখ্যাসহ বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ও অবশ্যকর্তব্য ও পরম্পরাগতরীতি পালনের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ একই বিষয়ে আর একটি পুস্তক জৈমিনি কৃত 'মীমাংসা'। বৃহস্পতি প্রণীত লোকায়ত পুস্তকে গবেষণার ক্ষেত্রে কেবল ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর নির্ভর করার সমর্থনে যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই রকম আর একটি পুস্তক আছে অগস্ত্যের রচনা, নাম 'অগস্ত্যমত'। তাতে গবেষাণর ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাথে শ্রুতির উপরও নির্ভর করার যুক্তিবত্তা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আর একটি

পুস্তকের নাম 'বিষ্ণুধর্ম'। ধর্ম শব্দের মৌলিক অর্থ হচ্ছে পারিশ্রমিক বা প্রতিদান, কিন্তু সাধারণতঃ শব্দটি উপাসনা-পদ্ধতি ও পরকাল-বিষয়ক নীতি ও তত্ত্বের অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে। 'বিষ্ণুধর্মের' অর্থ তাহলে দাঁড়ায় ঈশ্বর-ধর্ম। এখানে ঈশ্বর হচ্ছেন নারায়ণ। এ ছাড়া, দেবল, শুক্র, ভার্গব, বৃহস্পতি, যাজ্ঞবল্ক্য ও মনু, ব্যাসের এই ছয়জন শিষ্যের ছয়টি পুস্তক আছে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় হিন্দুদের আরও বহু গ্রন্থ আছে। সমস্ত গ্রন্থের নাম জানা, বিশেষ করে আমার মত বিদেশীর পক্ষে কি করে সম্ভব?

ভারতীয়দের আর একটি মহাগ্রন্থ আছে, যার প্রতি ওদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা বশতঃ ওরা দৃঢ়ভাবে দাবী করে যে অন্য সমস্ত পুস্তকে যা আছে তার সবই এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু এ গ্রন্থে যা আছে তার সবটুকু অন্য কোনও পুস্তকে নাই। গ্রন্থটির নাম 'ভারত', পরাশরপুত্র ব্যাসদেব কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকালে এটি রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির নামেতেও এই মহাযুদ্ধের ইঙ্গিত আছে। এর আঠার খণ্ডে এক লক্ষ শ্লোক আছে। প্রত্যেক খণ্ডকে 'পর্ব' বলা হয়।

১। সভাপর্ব : অর্থাৎ রাজার আবাস।

২। অরণ্য : অর্থাৎ পাণ্ডবদের জনবিরল প্রান্তরে নির্বাসন।

৩। বিরাট : অজ্ঞাতবাসকালে যে রাজার রাজ্যে পাণ্ডবরা বাস করেছিল।

৪। উদ্যোগ : যুদ্ধায়োজন।

৫। ভীষ্ম :

৬। দ্রোণ : ব্রাহ্মণ

৭। কর্ণ : সূর্য পুত্র

৮। শল্য : দুর্যোধনের ভ্রাতা

(৫–৮) এঁরা সব বীর শ্রেষ্ঠ, যুদ্ধে পরপর নিহত হয়েছিলেন।

৯। গদা।

১০। সৌপ্তিক : ঘুমন্ত লোকদের হত্যা। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নিশীথে পাঞ্চাল নগরী আক্রমণ করে ঘুমন্ত নাগরিকগণকে হত্যা করেছিল।

১১। জলপ্রদানিক : শব সৎকার জনিত আহার বিহারে অশৌচ পালনের পর স্নান করে মৃতের উদ্দেশ্যে জল তর্পণ করা।

১২। স্ত্রী : নারীদের বিলাপ।

১৩। শান্তি : হৃদয় থেকে ক্রোধ দূর করার বিষয়ে। এতে চার খণ্ডে চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে।

ক। রাজধর্ম : রাজার সদাচরণ।

খ। দানধর্ম : দান করার পুণ্য।

গ। আপদ্ধর্ম : বিপন্নকে সাহায্য করা।

ঘ। মোক্ষধর্ম : ভব সংসার থেকে মুক্তি পাওয়ার পুরস্কার।

১৪। অশ্বমেধ : সৈন্যসহ একটি অশ্বকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে যাঁর অশ্ব, তিনি পৃথিবীর অধীশ্বর। যে তাঁর আধিপত্য অস্বীকার করবে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করা হয়। সঙ্গে ব্রাহ্মণরা থাকে; অশ্বটি যেখানে যেখানে মলত্যাগ করে তারা সেখানে যজ্ঞানুষ্ঠান করে।

১৫। মৌষল : বাসুদেবের সগোত্র যাদবদের অন্তর্যুদ্ধ।

১৬। আশ্রম বাস : অর্থাৎ নিজ গৃহ ত্যাগ করে অন্যত্র বাস।

১৭। প্রস্থান : মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে রাজ্য ত্যাগ।

১৮। স্বর্গারোহন।

এই আঠার খণ্ডের পরেও আর একখণ্ড আছে যার নাম হরিবংশ পুরাণ। এতে বাসুদেবের জীবনবৃত্তান্ত আছে। এই ভারত গ্রন্থে এমন কতকগুলি বাক্য আছে হেঁয়ালির মত যার একাধিক অর্থ হয়। তার কারণ সম্বন্ধে ওরা বলে যে তাঁর মুখনিসৃত ভারত কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য ব্যাস ব্রহ্মাকে একজন লিপিকার সংগ্রহ করে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর পুত্র গজানন বিনায়ককে এ কাজে নিযুক্ত করে আদেশ দিলেন যেন সে মুহূর্ত্তের জন্যও লেখা বন্ধ না করে। ব্যাস তখন তাকে আদেশ দিলেন অর্থ না বুঝে যেন সে কোনও বাক্য না লেখে। ব্যাস তারপর এমন সব শ্লোক রচনা করতে লাগলেন যার অর্থ বোঝার জন্য বিনায়ককে লেখা বন্ধ রেখে কিছুক্ষণ চিন্তা করতে হোত। এই বিরতিতে ব্যাসও বিশ্রামের সুযোগ করে নিতেন।*

* হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত আবু রায়হান আলবেরুনীর 'তাহ্‌কিক্‌ মা লিল্‌ হিন্দ নামক' আরবী গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের অংশবিশেষের অনুবাদ।